বাঙালিত্ব বড়ো বেশি

অলোক রায়

১৮৫৪ সালে হ্যালিডে যখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন তখন সমগ্র প্রদেশটি সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল - অখন্ড বাংলা (৮৫,০০০ বর্গমাইল), বিহার (৪২,০০০ বর্গমাইল), ওড়িশা (৭০০ বর্গমাইল), ওড়িশার করদ রাজ্য (১৫,০০০ বর্গমাইল), ছোটনাগপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের করদ রাজ্য (৬২,০০০ বর্গমাইল), অসম (২৭,৫০০ বর্গমাইল) এবং আরাকান (১৮,০০০ বর্গমাইল) - সব মিলিয়ে ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল। পরে অনেক পরিবর্তন ঘটে। তবে অনেকদিন পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও অসম বোঝাতো। ১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আকার ১৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (১৯০১ সেন্সাস)। অনেকদিন থেকে বিদেশি শাসক জাতীয়তাবাদী বাঙালি হিন্দুকে একটা 'শিক্ষা' দেওয়ার কথা ভেবেছে। আর তারই পরিণামে বঙ্গবিভাগের সরকারি ঘোষণা প্রচারিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, ঘোষণা কার্যকর হয় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫। পুরনো প্রদেশ ভেঙে নতুন একটি প্রদেশ গড়া হল চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজশাহি বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা এবং অসম নিয়ে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ উনিশ শতকেই বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালির মধ্যে দেখা গেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ব্যবহারিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কারণে অধিকাংশ বাঙালির পক্ষে মেনে নওয়া সহজ ছিল না। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রায়শ এতই প্রবল ভাবে প্রকাশ পায় যে মিলন ও সংহতির প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি নানাধরনের উদ্যোগ সংকল্প গ্রহণ করে। বিদেশি দ্রব্য বর্জন, রাখিবন্ধন, মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, শিবাজি-উৎসব এবং অনতিপরে চরমপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রসার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আমরা বলি স্বদেশি অন্দোলন। আসলে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। কর্জন শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে (জানুয়ারি ১৮৯৯) নানাভাবে বাঙালির তথাকথিত অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলে। কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচনের রীতিপদ্ধতি পরিবর্তন থেকে শু করে কলকাতার সমাবর্তনে ভাইসরয়ের বক্তৃতা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা বাঙালির মনে বিদেশি শাসক সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি ও ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, প্রথম শিবাজী-উৎসব এবং সরলা দেবীর বীরাষ্টমী প্রবর্তন, 'সন্ধ্যা' এবং পরে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ, টাউন হল্ থেকে শু করে বর্ধমানে প্রাদেশিক সম্মেলন ও পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা - সব মিলিয়ে বিশ শতকের প্রথম দশকে একধরনের নবজাগ্রত বাঙালিত্ববোধ জন্ম নিয়েছে।

বঙ্গচ্ছেদ যেদিন কার্যকর হল, সেই দিনটি জাতীয় সম্মিলন ও সংহতি দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ - 'আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করে নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই, ভাই ভাই এক ঠাঁই।' সকালে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্-সম্প্রদায়

পরিচালিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতপালনের প্রস্তাব দেন। বিকেল সাড়ে তিনটের সময়ে আপার সার্কুলার রোডে (ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের পাশে) একটি মাঠে ফেডারেশন হল্ বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু। জনসভায় অসুস্থ আনন্দমোহনের ভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ভাষণের শেষে ইংরেজি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আশুতোষ চৌধুরী (রবীন্দ্রনাথ তার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন) -

Whereas the government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali Nation, we hereby pledge and proclaim that we, as a people, shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So God help us.এখানে লক্ষণীয়, প্রদেশ-বিভাগের কথা উল্লেখিত হলেও শুধু ‘বাঙালি জাতি’র প্রতিবাদের কথা বলা হচ্ছে। প্রদেশ-বিভাগের জন্য বিহার-ওড়িশা-অসমবাসী কোনো প্রতিবাদ করেছে বলে মনে হচ্ছে না। এই সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে স্বদেশি গানগুলি বাঙালির মুখে মুখে ফিরেছে, তার মধ্যেও বাংলাদেশের কথাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে - আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, আজিবাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল।

কার্লাইল-সার্কুলার প্রকাশের পর (স্টেটসম্যান, ২২ অক্টোবর ১৯০৫) দেশের নেতারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন, সেখানে সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু সরকারি সার্কুলার প্রত্যাখান করে ‘কলকাতা’র ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে জানান, ‘আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গবর্নমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।’ ২৯ অক্টোবর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বাংলার ভগিনীদের ন্যাশনাল ফান্ড তথা ধনভান্ডারে দান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হয়, তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী রবীন্দ্রনাথ - ‘তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাঁটা পড়িবে - এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে জন্ম দিয়া বাঙালির ভগিনী করিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে।’

স্বদেশি আন্দোলন অনেক পরিমাণে বাঙালি-জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। হয়তো উনিশ শতকেই এই জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল। তবে ভারতবর্ষীয় সভা, ভারত সভা, হিন্দু মেলা, ন্যাশনাল কনফারেন্স, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনে বাঙালি অংশগ্রহণ করেছে এবং সেখানে এক ধরনের অস্পষ্ট ভারতীয়ত্ববোধ কাজ করেছে - ‘আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য।..... মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতেএই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় - ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।’ (চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য, ১৮৬৮০। তখন জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হত - ‘মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান/ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান।’ কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল কলকাতা, কারণ বিদেশি শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অবস্থান এই শহরে, তথা বাংলা দেশে। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ বাঙালি পেয়েছে সব আগে। রাজকার্যে সহযোগিতা করেছে বাঙালি (শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে), আবার স্বাধীন জীবিকা গ্রহণেও (চিকিৎসক, আইনজীবী, বাস্তুকার, শিক্ষক) সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এর ফলে এমন ধারনা প্রসার লাভ করে - হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস্ টুডে.... ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষে মানুষের অবয়ব, বর্ণ, এমনকি ধর্ম অপেক্ষা ভাষার গুত্ব সমধিক। নিধুবাবুর গানে সব দেশের সব

মানুষের মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে, 'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা/বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।' ঈশ্বর গুপ্ত, যিনি বলেন 'কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি..../বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া', তিনি 'মাতৃভাষা'র স্তবগান করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই - 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা/তুমি তার সেবা কর সুখে।' বাঙালির কাছে বাংলা হল মাতৃভাষা তথা স্বদেশীয় ভাষা, যেমন ওড়িশাবাসী কাছে ওড়িয়া, অসমবাসীর কাছে অসমীয়া। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষায় ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালির অগ্রাধিকার যেমন লক্ষণীয়, তেমনি বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চায় শিক্ষিত বাঙালির অত্যুৎসাহ একধরনের জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' ও 'কবি-মাতৃভাষা' কবিতার কথা মনে পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'য় সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে বাংলা ভাষা চর্চার কথা বলেছেন, 'ব াংলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙালি কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।' বঙ্কিমচন্দ্রই ঈশ্বর গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' এবং তাঁর রচনা 'খাঁটি বাংলা' বলে অভিহিত করেন, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদারের মত কবিকেও উদ্বুদ্ধ করে - 'বাঙালি নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশি জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাংলাটি, এই খাঁটি দেশি কথাগুলি মার প্রসাদ। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশকালে তিন কোটি ব াঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলেছে, তাদের কথাই ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র্য স্বাজাত্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি। অতুলপ্রসাদ সেনের গান শুধু আত্মশ্লাঘার প্রকাশ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়ও বটে - 'মোদের গরব মোদের আশা/অমি মরি বাংলা ভাষ া!/তোমার কোলে তোমার বোলে/কতই শান্তি ভালোবাসা।'

এর পাশাপাশি বাঙালির বাহুবল প্রতিপাদন, বাঙালির কলঙ্ক অপনোদন, বাংলার ইতিহাস রচনার প্রয়াস চলেছে। 'বাঙা লি আজকাল বড় হইতে চায়, হায়! বাঙালির ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?' (বঙ্গদর্শন, ১৮৮১)। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক অ ান্দোলনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও ১৮৮৪ সালে 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বাঙালির ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্য বলা হল, 'যে বলে যে বাঙালি চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালি চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভী, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল।

বিশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত হয় কণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১) কাব্য। তখনও বন্দেমাতরম্ ধবনিতে কম্পিত হয়নি বঙ্গদেশ, কিন্তু কবির কাব্যের প্রথম কবিতার শিরোনাম 'বন্দেমাতরম্' এবং সেখানে শোনা গেছে কবির উদ াত্ত আহ্বান - 'মনুষ্যত্ব-মহত্বের পূত উপাদান/অঙ্গের ভূষণ কর হে বঙ্গসন্তান।' পরে ১৯০৫ সালে কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে কবিতায় সংযোজন অং
শটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় -

অয়ি মা শ্যামাঙ্গ বঙ্গ, অয়ি চির-গরীয়সী,
জননী আমার,
রাতুল চরণে তব অর্পিতেছে দীনহীন
পূজা-উপচার।

কাব্যের শেষে বঙ্গবাণীকে কবি ধরে দেন এইভাবে -

হাজার আঘাত কন রাজা তফাত রাখিতে,
ভাই কি কভু ভাইকে ছেড়ে পারবে থাকিতে?
মিলল আসি বাংলাবাসী একটি মেলাতে।

একলা নহি - অর্ঘ্য বহি আসছে লাখো ভাই,
জনতা ঐ বাড়ছে পিছে এগিয়ে নিয়ে যাই;
লজ্জা গ্লানি জ্বালিয়ে নে রে বজ্রজ্বালাতে। (মিলন)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধিক্ষণ'-এর (১৯০৫) আখ্যাপত্রে আমারা পারি 'যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একত ার/তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।' কবির মনে হয়েছে, 'যে খুশি টিটকারি দিক/অন্তরে বুঝেছি ঠিক - /এ কেবল নহেক হুজুগ;/সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ।' স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে হুজুগ ছিল না এমন নয়, কিন্তু নবযুগ সৃষ্টির উন্মাদন াও ছিল। বাঙালি বিশেষভাবে যেন বাঙালিত্ব বোধ এবং ঘোষণা করতে শু করে এই সময়ে থেকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বদেশিযুগের নাটক এবং কাব্য বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কিছু গান ও কবিতা ছাড়া এইসব রচনার সাহিত্যমূল্য খুব বেশি, এমন বলা যায় না। নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করে, যথা - গিরিশচন্দ্র ঘে াষের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবারপতন; ক্ষীরোদপ্রস াদ বিদ্যাবিনোদের বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য, পলাশির প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার, বাংলার মসনদ; অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নন্দকুমারের ফাঁসি; অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গবিক্রম। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ইতিহাস-গবেষণ ার ফল সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম 'দুইটি হতভাগ্য নবাবদ্বয়কে জনপ্রিয় বীরের মহিমায় উন্নীত করিয়াছিল।' নিখিলনাথ র ায় ওই ধারায় লেখেন প্রতাপাদিত্য, সোনার বাংলা, মুর্শিদাবাদ কাহিনী। সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা, বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ প্রভৃতি বইয়ের কথাও মনে পড়বে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যে াগ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের পটভূমিতে ব্রহ্মবান্ধবকে স্থাপন করে লেখেন, 'এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপ ারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিভেদে ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ (নভেম্বর ১৯০৪), তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিল। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে-ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা।' 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন - 'সকল কথার মাঝে সহজ কথায় ব াঙালির প্রাণের কথা আমরা সবাই বলিব। যাহা শুন - যাহা শিখ - যাহা কর, হিন্দু থাকিও - বাঙালি থাকিও।' স্বদেশি অ ান্দোলন মিলনের জয়গাথা রচনা করলেও তা ছিল মুখ্যত বাঙালির জয়গাথা।

ওড়িশা বা উড়িষ্যা বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য। প্রাচীনকালে কাঁশাই ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ (আধুনিক ব্যাল্বের জেলা ও মেদিনীপুরের কিছু অংশ) 'উৎকল' নামে, এবং বৈতরণী থেকে গোদাবরী (পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী) পর্যন্ত স্থান 'কলিঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। আদিমধ্যযুগে মেদিনীপুর থেকে গঞ্জাম পর্যন্ত দেশের নাম ছিল তোসলি (প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের রাজধানী)। নন্দ এবং পরবর্তীকালে অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করেন, সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত গৌড়রাজারা গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত অধিকার করেন। তবে ওড়িশায় যাবতীয় প্রাচীন কীর্তির অধিকারীশ্রীকাকুলমের অন্তর্গত কলিঙ্গনগরের গঙ্গবংসীয় নৃপতি অনন্তবর্মা। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, চোড়গঙ্গের সাম্রাজ্য ভাগীরথীর তীর থেকে গে াদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গবংশীয়রা শৈব ছিলেন, চোড়গঙ্গ বংশীয়রা বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁরাই পুরীর দেবতা জগন্নাথ পুষোত্তমের মন্দির নির্মাণ করেন। চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তৃতীয় অনঙ্গভীম জগন্নাথের পরম ভক্ত ছিলেন। তৃতীয় অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহ কণারকের সূর্যমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

তবে বাঙালি উনিশ শতক থেকে ওড়িশাকে বাংলার উপনিবেশ মনে করতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহে বর্ণিত

একচি তাম্রফলক অবলম্বনে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন অনন্তবর্মা বাঙালি ছিলেন। তিনি বাংলার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য বাঙালির পূর্বগৌরবের চিরস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে অনন্তবর্মা এবং চোড়গঙ্গদের নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন - 'উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, ইনিই তাহার আদিপুষ।.... ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙালি গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশর্চ্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাংলার পাঠানেরা যতবার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, ততবার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল।...... এই সকল কথার পর্যালোচনা করিয়া হন্টর সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশি রাঢ়ীসৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, যাহা বর্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্মান উইলিয়ম ইংলন্ড জয় করিয়া নর্মান্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন পটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাংলার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আত্রমণ করিলে, কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আত্রমণ করিত এবং এই রাঢ়ীগণ কর্ত্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।' তথ্যগত অপ্রতুলতা এবং ইতিহাসের ভ্রান্তপাঠ, উনিশ শতকে বাঙালিকে এই ধরনের গবেষণায় প্রণোদিত করতে পারে, কিন্তু ওড়িশা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণার অভাব এবং বাঙালির অতীত শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে অদ্ভুত আত্মশ্লাঘা বাঙালির মনে কাজ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ওড়িশার সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ অবশ্য দীর্ঘদিনের। বিশেষত মহাপ্রভু তাঁর শেষ জীবন নীলাচলে অতিবাহিত করেন। জগন্নাথ দর্শনে বাঙালি বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিত্রম করেছিল। অবশ্য ওড়িশায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ১৮০৩ সালের আগে ঘটেনি (এই সময়ে কটক-পুরী অঞ্চল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হয়)। ১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে যখন পূর্ববাংলা-অসম এবং পশ্চিমবাংলা-বিহার-ওড়িশা - এই দুই প্রদেশে ভাগ করা হয়, তখন ওড়িয়াদের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিত্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। (মধুসূদন দাসের নেতৃত্বে ১৯০৩ সালে প্রথম উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলন এবং পরে ১৯০৭ সালে উৎকল ঐক্য সম্মেলন ওড়িশার নবজাগরণে সাহায্য করে। কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন ওড়িয়াবাষীদের নিয়ে স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠন)। অপরিসীম দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধে ক্লিষ্ট ওড়িশা সব দিক থেকেই বাংলার থেকে পিছিয়ে ছিল। ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বীশাখার একই প্রশাখা থেকে ওড়িয়া এবং বাংলা-অসমীয়া ভাষা উদ্ভুত। অনেকদিন পর্যন্ত ওড়িয়াকে বাঙালিরা বাংলার উপভাষা বলে গণ্য করত। (এক সময়ে ওড়িয়াভাষাকে বাংলা ভাষার 'কন্যা' বলে প্রচারের ফলে ওড়িয়াভাষার বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়)। ইংরেজ শাসনাধীন ওড়িশায় বাঙালি এমনই আধিপত্য বিস্তার করে যে উনিশ শতকে বাংলাভাষাতেই সেখানে লেখাপড়া চলেছে, আইন-আদালতের কাজেও বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। ওড়িশায় প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয় কটকে ১৮২৩ সালে, প্রথম কলেজও কটকে ১৮৬৮ সালে। ফলে ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হয় অনেক দেরিতে, এবং সেখানেও রাধানাথ রায়ের মতো বাঙালির ভূমিকা অগ্রগণ্য। রাধানাথ প্রথমে বাংলায় লিখতেন, পরে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন (অন্যদিকে বিশ শতকের দুয়ের দশকে অন্নদাশঙ্কর রায় প্রথমে ওড়িয়াভাষায় লিখতেন, পরে বাংলায় লিখতে শু করেন)।

ওড়িশা ১৯৩৬ সালে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওড়িশা রাজ্যের আয়তন ষাট হাজার বর্গমাইল। ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা দু'কোটি। সম্প্রতিকালে, একদা-অনুন্নত অবহেলিত ওড়িশায় শিল্প-বাণিজ্যের সমধিক প্রসার ঘটে। কুটিরশিল্পের প্রসিদ্ধি আগেই ছিল, এখন আবও প্রচার ও সমাদর দেখা যাচ্ছে। ওড়িশী নৃত্য গীত ওড়িশার বাইরেও সমাদৃত হয়েছে। ওড়িয়া লিপির বাধা অতিত্রম করলে ওড়িয়াভাষাও বাঙালির দুর্বোধ্য নয়। অথচ ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে আজও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সেভাবে পরিচয় ঘটল না। যতদূর মনে হয় ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছ মান আধ গুন্ঠ' ছাড়া আর কোনো উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রচার লাভ করেনি। কালিন্দীচরন পাণিগ্রাহীর 'মাটির মণিষ' উপন্যাসটির লীলা রায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ হয়তো কেউ কেউ পড়েছেন, কিন্তু কালিন্দীচরণের কিংবা হরেকৃষ্ণ মহতাব, অনন্তপ্রসাদ পান্ডু রামপ্রসাদ সিংহ, কাহ্নুচরণ

মহাপাত্র, গোপীনাথ মহান্তির উপন্যাসের খবর আমরা রাখি না। পুরী চিল্কা কণারক ভুবনেশ্বরের ট্যুরিস্ট আকর্ষণস্থল বা তীর্থস্থান। অথচ ওড়িশার সঙ্গে আরও অনেকক্ষেত্রে বাংলার মিলন প্রত্যাশিত ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে যে মিলন ঘটেনি, আজ সে মিলনের জন্য সচেষ্ট হওয়ার সময় এসেছে।

ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেও অসমীয়া-বাংলা অনেকদিন একই ভাষা বলে বিবেচিত হয়েছে। অসমীয়া ভাষার লিপির সঙ্গেও বাংলা লিপির সাদৃশ্য আছে। চর্যাগীতিকে বাংলার মতো ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষারও প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়। তবে অসম বা কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা তমসাবৃত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ অসমে প্রবেশ করেছে, বসবাস করেছে এংব অনেক জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে অসম বা উত্তরপূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্মিলিত অসমীয়া জাতি ও সংস্কৃতি। উনিশ শতকে অসমে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মরাজের কাছ থেকে অসম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া কেড়ে নেয়। যদিও এই সময়ে ইংরেজ শাসনের বিদ্ধে এই সব অঞ্চলে একাধিক বিদ্রোহ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গঠিত হলে, বাংলা, বিহার, ওড়িশার সঙ্গে অসম যুক্ত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদের সময়ে পূর্ববাংলা ও অসম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়, আবার ১৯১২ সালে পূর্বব াংলা ও পশ্চিমবাংলার সম্মিলনকালে অসম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে (যদিও ১৮৭৪-১৯০৫ সালের মতো চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসেবে)। অবশেষে ১৯৩৫ সালে অন্যান্য প্রদেশের মতো অসমে তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয়।

ওড়িশার মতো অসমকেও অনেকদিন বাংলার উপনিবেশ বিবেচনা করেছে বাঙালি। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরপূর্ব বাংলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন - 'দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাংলাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাংলার সংস্পর্শে আসিয়াছে। যেমন এখন যাহাকে বাংলা বলি, আগে তাহা বাংলা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখ ানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীনকালে এক আর্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধহয়, এই র াজ্য পূর্বাঞ্চলের অনার্যভূমিমধ্যে একা আর্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যে াতিষের ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাংলার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌন্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাংলা যে সময়ে অনার্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্যভূমি হইবে, ইহা বিষম সমস্যা।.... বোধহয়, তাহারা প্রথমে বাংলায় আসিয়া বাংলার পশ্চিমভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্যেরা দাক্ষিণ াত্য জয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সোনকার অনার্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্ব মুখে আসিয়া বাংলা দখল করিয়া ছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য ঔপনিবেশিকেরা ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।' (বঙ্গ দর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯)। এখানে পুরাণ-ইতিহাস মিলে ইচ্ছাপূরণের কাব্য রচনা করেছে। তবে 'বাংলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে সেই মহাভারতের কাল থেকে হোসেন শাহের কাল পর্যন্ত কামরূপের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস দেখা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ হল হবুচন্দ্র রাজা ও গোবুচন্দ্র মন্ত্রীর কাহিনী, যার মধ্য দিয়ে জানা যায়, 'বাংলায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে, রাজা হয় সেই বাংলা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষদেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুষদের কথা বলিতেছি না; তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।'

অসমীয়া এবং বাঙালির সম্পর্ক কোনোদিনই সহজ ছিল না। অসমীয়ারা মনে করতেন উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনাধিক ারের সঙ্গে সঙ্গেঅসমে বাঙালির অনুপ্রবেশ এবং আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস ঘটে। অসমীয়া শিশুদের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার যে সব স্কুল স্থাপন করে, তার নাম ছিল আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হেমচন্দ্র গোস্বামী - যাঁরা আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের দিক্‌পাল, তাঁদের সবাইকে শৈশবে স্কুলে 'শিশু শিক্ষা' পড়তে হয়েছে। তখন অসমে সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলার প্রচলন থাকায় অসমীয়াদের বাংলা শিখতেই হত। অসমে উচ্চশিক্ষ

ার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে অসমীয়ারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় যত ভালো ফল কক না কেন, কলেজে পড়বার জন্য তাঁদের কলকাতায় আসতে হত (লক্ষ্মীনাথ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করেন)। অন্যদিকে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-চর্চারও কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ১৮৮৯ সালে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার সম্পাদনায় 'জোনাকী' পত্রিকা প্রকাশিত হত এই শহর থেকে। এমনকি অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভার কাজকর্মও হত কলকাতায়, যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন লক্ষ্মীনাথ। এই সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল - অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিসাধন, স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমীয়া ভাষা প্রচলনের জন্য আন্দোলন, অসমীয়া সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সর্বমান্য এক-ভাষাসৃষ্টি, প্রাচীন পুথিপত্র সংগ্রহ য় প্রকাশ, প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদির টীকা ব্যাখ্যা আলোচনা প্রকাশ, অসমীয়া ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং অসমীয়া ভাষায় সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশ। লক্ষ্মীনাথের জীবনীকার হেম বয়া জানিয়েছেন, বাংলার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের বিদ্ধে সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন লড়াই করেছেন এবং অসমীয়া ভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো বিরূপতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, তিনি কলকাতায় অবস্থানকালে ১৮৯১ সালে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।শ্বশুরবাড়িতে বাংলা ভাষাসাহিত্য-চর্চা তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। প্রজ্ঞাসুন্দরী সম্পাদিত 'পুণ্য' এবং রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাংলা-অসমীয়া ভাষাবিতর্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-লক্ষ্মীনাথের বাদপ্রতিবাদের কথা একটু বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভাষাবিচ্ছেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপে সবেগে ব্যাপ্তহইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন এক গৃহবর্তী হইতে পারিত।' রবীন্দ্রনাথের তাই পরামর্শ 'আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনই সেই দেশের পক্ষেও।..... আসামী এবং উড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোন অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভান্ডারের দৈন্যবশতই সাধুসাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য। অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষার অনৈক্য আরও সামান্য। লেখক কটকে বাল্যকালে উড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাধুবাংলারপ্রভেদ তর্জনীর সহিত মধ্যম অঙ্গুলির অপেক্ষা অধিক নহে।' কিন্তু এ সব কথা আত্মস্বাতন্ত্র্যের আকাঙক্ষায় উদ্বুদ্ধ ওড়িয়া ও অসমীয়াদের ভালো লাগবার কথা নয়। লক্ষ্মীনাথ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করে এই সময়ে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। ভারতী (আশ্বিন ১৩০৫) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে 'আসামের কথা' নামে একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধপ্রকাশিত হয়। 'পুণ্য' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫) পত্রিকায় লক্ষ্মীনাথ (বাঙালি-করার প্রচেষ্টায় তাঁর পদবী 'বিদ্যাবর্ষ' ছাপা হত) লেখেন 'আসামী ভাষা' প্রবন্ধ। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'শ্বশুরবাড়ির এই সাহিত্যিক মহিলা আর পুষেরা অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন ধীরে ধীরে। তাঁরাই এগিয়ে এসে আমাকে তর্ক যুদ্ধে নামাতেন।.... তাঁরা মনে করতেন পূর্ববঙ্গের ভাষা যেমন বাংলা ভাষারই একটা অঙ্গ অমসীয়া ভাষাও তেমনি।... আমার সঙ্গে যখন আমার সাহিত্যিক শ্যালকদের তর্কাতর্কি হতে শু করল এবং পরে 'রবিকাকা'র কাছে গিয়ে পৌঁছাল, তখনশ্বশুর জামাইয়ের মধ্যেও একটি ছোটখাট তর্কযুদ্ধ বাধল। তারপর মুখের তর্ক বন্ধ হলে রবিকাকা 'ভারতী' পত্রিকায় অসমীয়া ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে লিখলেন এক প্রবন্ধ। আমি তার প্রতিবাদ লিখে 'ভারতী'তে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। 'প্রতিবাদ'টা 'ভারতী'তে ছাপা হয়। ওদিকে 'পুণ্য' পত্রিকাতেও আমার প্রতিবাদ বেল। এ রকমভাবে তর্কযুদ্ধের শেষ হল।' (দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮, পৃ. ১৯৪)। অবশ্য তর্কযুদ্ধ যে তখনই শেষ হয়েছে তা নয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে পূর্ববাংলা ও অসম নিয়ে প্রদেশ গঠনের ঘোষণায় বাঙালি উত্তেজিত বোধ করেছে টাউন হল্-এ ১৯০৪ সালের ১৮ মার্চ জনসভায় ভাগ্যকুলের রাজা সীতানাথ রায় উত্তেজনার মুখে বলে

ফেলেন, "I say its is no light matter for 11 million of people to be driven to a strange land, to uncongenial climate , to the land of Kala joar or black fever and to be forced to form alliance with strange people with whom we have nothing in common." বেঙ্গলি পত্রিকা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের মন্তব্যের বিদ্ধতা করে, কারণ অসমীয়াদের মনে আঘাত করে এমন কোনো কথা এ সময়ে বলা অনুচিত। কিন্তু বাঙালিদের আতঙ্ক গোপন থাকেনি, তাদের আশঙ্কা ছিল শাসকদের আনুকূল্যে অসম ধীরে ধীরে পূর্ববাংলাকে গ্রাস করে ফেলবে এবং অসমের একান্ত স্থানিক শাসনধারা বাঙালির বিপদের কারণ হবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থনে ওড়িশা বা অসমে এমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। বাঙালি তখন নিজের শুভাশুভ নিয়ে যতটা ব্যস্ত, ওড়িশা-অসমের ভবিষৎ নিয়ে ততটা চিন্তিত নয়। স্বদেশি আন্দোলনের ঐতিহাসিকের যে জন্য মনে হয়েছে, "….the neighboring Biharis, Oriyas and Assamese with few exceptions remained utterly aloof if not positively hostile to what was after all essentially a Bengali movement." (Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal : 1903-1908).

ওড়িয়া সাহিত্যের মতো অসমীয়া সাহিত্যেরও নবজাগরণ ঘটে উনিশ শতকের শেষার্ধে। ১৮৩৬ সালে বিদ্যালয়ে ও অ াদালতে অসমীয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা সরকারি নির্দেশে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর প্রতিত্রিয়ায় লেখা হতে থ াকে রবিনসনের অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ (১৮৩৯), ব্রাউনের অসমীয় ভাষার ব্যাকরণবিধি (১৮৪৮), ব্রনসনের অসমীয় া ভাষার অভিধান (১৮৬৭), যার উদ্যোক্তা ছিলেন অ্যামেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদরিরা। অসমে তাঁরাই প্রথম মুদ্রণযন্ত্র (১৮৩৬) আনেন এবং সংবাদপত্র 'অণোদয়' (১৮৪৪) প্রকাশ করেন। অসমীয়াদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী পুষ অ ানন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, পরে গুণাভিরাম বয়া (অসম-বন্ধু মাসিকপত্রের সম্পাদক)। এঁরা সবাই কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। এবং কলকাতা থেকেই বইপত্র ছেপেছেন। অবশেষে ১৮৭২ সালে অসমে অসমীয়া ভাষা সরকারি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'জোনাকী' পত্রিকার কথা আগে বলা হয়েছে। লক্ষ্মীনাথের মাসিকপত্র 'বাহী'ও (১৯০৫-৪৫) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ দত্তরা থেকে শু করে দেবকান্ত বয়া - অসমীয়া কাব্যধারার বিবর্তনে প্রত্যেকের ভূমিকা গুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পে শরৎচন্দ্র গোস্বামী, মহিমচন্দ্র বরা, হলিরাম ডেকা, বীণা বয় া,রমা দাস থেকে শু করে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য অসমীয়া ছোটগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের ইয়া-ইঙ্গম, পদ্ম বরকাকতীর মনর দপন, হিতেশ ডেকার মাটি কার এবং ভাড়া ঘর, যোগেশ দাসের ডাওর আ নাই উপন্য াসের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যের মতো আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সে রকম পরিচয় নেই।
লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার মতো বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গেও বাঙালির তেমন ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটেনি।

সব মিলিয়ে মনে হয় ১৯০৫ সালে আমাদের মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তার অন্তত একটা কারণ, বাঙালিত্ব আমাদের বড়ো বেশি। নিশ্চয় পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ঐক্যের কথা আমরা বলি। কোথাও একটা ঐক্য আছে, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেকে তুচ্ছ ভাবা যেমন অন্যায়, তেমনি অন্যের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবাও অপরাধ। ইংরেজ শাসন, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাথমিকভাবে বাঙালিকে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধে দিয়েছে। এক সময়ে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালি'কে নিয়ে বেশ গৌরব বোধ করা হত। তারপর চাকা ঘুরেছে। ঐতিহাসিক কারণে অন্য প্রদেশে স্থানীয় ম ানুষজনের মনে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে বাঙালিকে ঘরে ফিরতে হয়েছে। এখন প্রসার যেটুকু সম্ভব তা মানসিক। পূর্বভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বাঙালির নতুন করে পরিচয় ঘটবে এমন আশা করা অন্যায় নয়। এই পরিচয় মুখ্যত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ঘটা সম্ভব। মিলন-মন্দিরে বিভিন্ন রাজ্যেরভাষাচর্চা যেমন হতে পারে, তেমনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সেখানে যথার্থ পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। ব াঙালিত্ব তাতে কোনোভাবে আহত হবে বলে মনে হয় না।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com